# সত্যেন্দ্রনাথ বসু

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

# সত্যেন্দ্রনাথ বসু

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
মুহাম্মদ ইব্রাহীম

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

বাতিঘর সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৫

প্রকাশক : বাতিঘর, প্রেসক্লাব ভবন, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
মুদ্রণ : পূর্বা, ৩৫ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ১০০ টাকা

Satyendranath Basu (a biography) by Muhammad Ibrahim
Published by Baatighar, Press Club Bhaban, Jamal Khan Road
Chittagong, Bangladesh
e-mail: baatighar_bd@yahoo.com Web: www.baatighar.com
Phone: 031 2869391, 01733 067005

Price: Taka 100 only

ISBN: 978-984-8825-34-1

আমার বন্ধু অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল
যে আমাকে অনেক কিছু পড়তে ও লিখতে বাধ্য করেছে

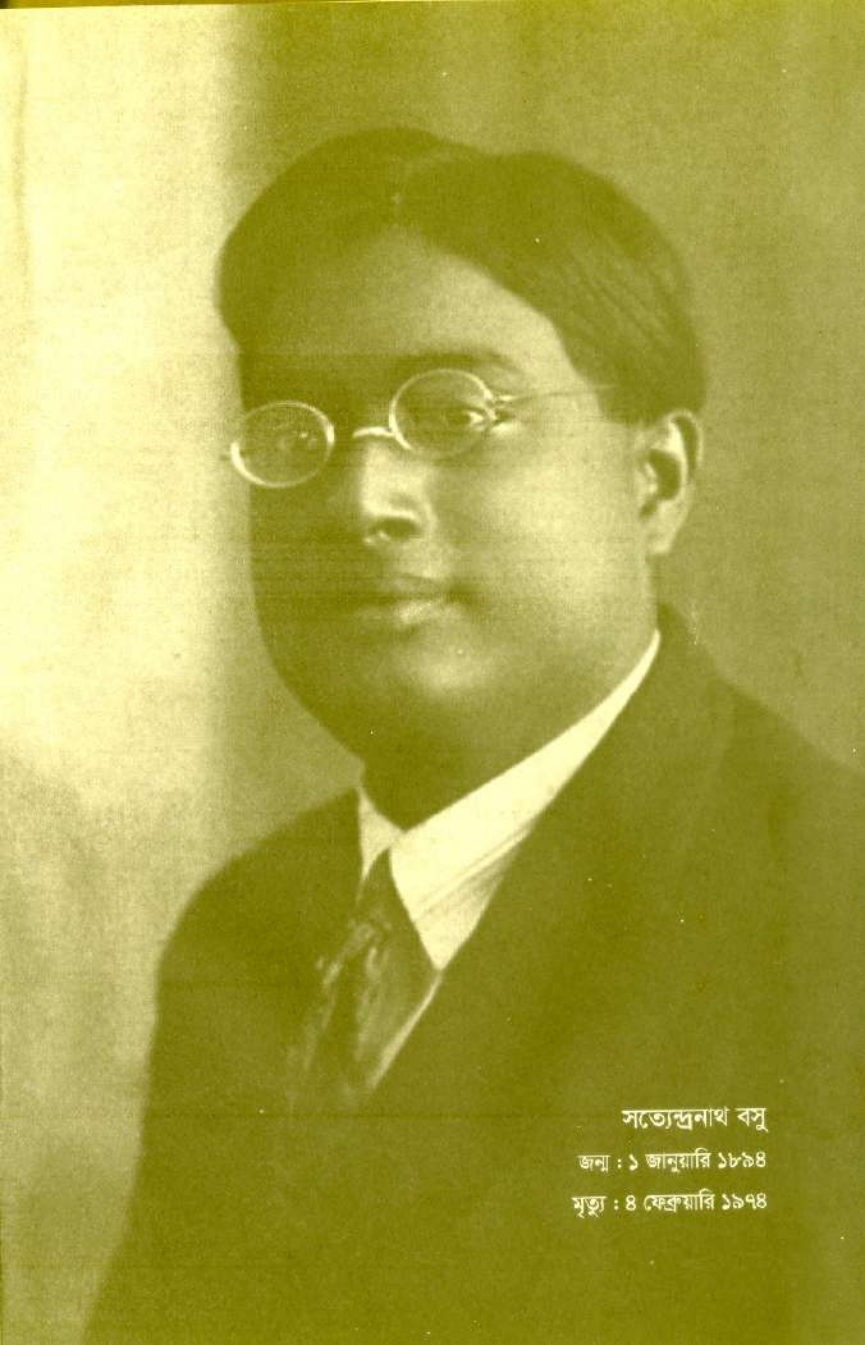

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম : ১ জানুয়ারি ১৮৯৪

মৃত্যু : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

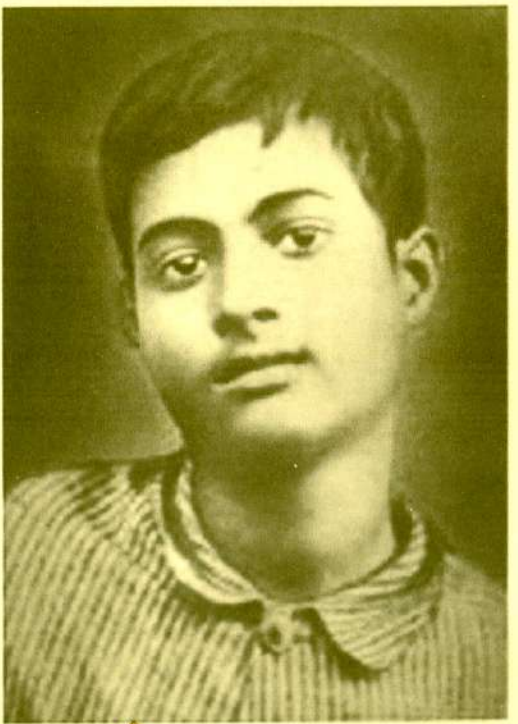

বালক সত্যেন বসু

## নতুন সংস্করণ প্রসঙ্গে

বহুদিন আগে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অনুরোধে সত্যেন বসু সম্পর্কে মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার একটি বই লিখেছিলাম ছোটদেরকে এই বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। সব সময় ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়েছি যে, আমাদের দেশের নয় শুধু, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের, আমার বিভাগের একজন শিক্ষকের নাম সারা দুনিয়ার স্কুল-কলেজ-বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্ররা পদার্থবিদ্যার বইতে যুগ যুগ ধরে পড়ছে। যখন পড়ছে তারা সবাই হয়তো জানছে না 'বোসন' কণিকা খ্যাত এই বোস লোকটি কোথাকার মানুষ। তবে আমরা তো জানি, এই আনন্দ আমরা রাখি কোথায়। একটু দুঃখও লাগে যে, আমাদের অনেক শিশু-কিশোর এমনকি বড়রাও এ খবরটি রাখে না। তাই শিশুদের জন্য সত্যেন বসু সম্পর্কে বইটি লিখে খুব ভালো লেগেছিল। এরপর সত্যেন বসুর জীবন ও কাজ নিয়ে নানা উপলক্ষে লেখালিখি করেছি বটে, তবে বই আকারে কিছু করা হয়নি।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোস সেন্টার আয়োজিত

একটি সেমিনারে তাঁর সঙ্গে সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেদিনের ঢাকা শহরের সম্পর্কগুলো তুলে ধরে দেখলাম উপস্থিত ছাত্র ও সুধীজন তা খুব উপভোগ করেছেন। তখন মনে হলো আর কিছু করতে না পারি, শিশুদের জন্য লেখা বইটির কিছু বিস্তৃতি ঘটিয়ে বসুর জীবনের এমন আরো অনেক বিষয়কে বইটির একটি নতুন সংস্করণে নিয়ে আসি। ভাবলাম এটি এমনভাবে করি যাতে বিজ্ঞানী বসু এবং মানুষ বসুকে দেখা যাবে, আবার তাঁর কৈশোর, যৌবন ও বড় কীর্তির সময়টায় আশপাশের বিদ্যানুরাগী সমাজটি আমার কাছে যতটুকু ধরা পড়েছে বসুর নিজের ও অন্যদের লেখা থেকে, তাও সংক্ষেপে একটু তুলে ধরি। প্রকাশনা সংস্থা বাতিঘর থেকে আসা তাগিদ আমার এ কাজটিকে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করেছে। পদার্থবিদ্যায় বসুর কাজ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা যাঁদের কাছে পৌঁছানোর কথা নয় তাঁদের অনেকেও হয়তো মানুষ সত্যেন বসুর জীবন কাহিনী থেকে আনন্দ পাবেন।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
জুলাই ২০১৬
ঢাকা

বিজ্ঞানের পাঠ্যবই পড়ার সময় সেখানে অতীতের বিখ্যাত সব বিজ্ঞানীর নামের সঙ্গে জড়ানো নানা বিষয় পাওয়া যায়। আর্কিমিডিসের সূত্র, নিউটনের সূত্র, ফ্যারাডের নিয়ম—এমনি নানা জিনিস শিখতে হয়। এক পর্যায়ে যদি এর মধ্যেই কোনো বিষয়ের সঙ্গে আমাদের দেশের কোনো মানুষের নামের আভাস থাকে, যেমন—'বসু সংখ্যায়ন' বা 'বোসন কণিকা' কেমন লাগবে? আর যদি জানতে পারো সে মানুষটি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু! আর তোমাদের মতো সারা দুনিয়ার ছাত্ররা তাঁর যে-আবিষ্কারের কথা পড়েছ সেটি করা হয়েছিল আমাদের ঢাকা শহরে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—কী ভালোই না লাগে তখন! এমন ভালো লাগার, এমনভাবে গর্বে বুক ফুলে ওঠার সুযোগ আমাদের জন্য করে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আজ থেকে অনেক-অনেক বছর আগে।

বড়-বড় বিজ্ঞানীদের নানা গল্প আমরা পড়ি। সেসব অধিকাংশই ভিনদেশের কাহিনী। কিন্তু বসু সংখ্যায়নের

কথা পড়তে-পড়তে আমাদের মনে বিজ্ঞানীদের যে-ছবিটি ভেসে উঠবে তার স্থান আমাদের ঢাকার রমনায়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। মনে পড়বে আজ যেখানে দোয়েল চত্বরটি রয়েছে সেখানে রাস্তা পেরিয়ে বাসা থেকে কার্জন হলে আসছেন এক তরুণ বিজ্ঞানী। এখানেই তাঁর সাধনার গবেষণাগার। আর এখানেই তাঁকে ঘিরে সৃষ্টি হয়ে চলেছে এক নতুন কিংবদন্তি।

ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে-বাড়িটিতে থাকতেন সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। দোয়েল চত্বর ঘেঁষে এখন সেখানে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান গ্রন্থাগার। বাসাটি আর দেখতে পাবে না বটে, কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে যদি কার্জন হলে আসো, তা হলে দেখবে, এখনো রয়ে গেছে তাঁর অনেক স্মৃতিচিহ্ন। তাঁর ব্যবহৃত টেবিল, আলমারি, পুরনো দিনের উঁচু ঘড়ি—সবই এখনো আছে; এখনো কাজে আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের। যে-ঘরে বসে তিনি কাজ করতেন সে-ঘরে তাঁর ছবি টাঙানো আছে। তাঁর ল্যাবরেটরি আজও সেখানে ল্যাবরেটরি। কিছু যন্ত্রপাতি ভাঙা অবস্থায় রয়ে গেছে, যেগুলো তিনি তৈরি করেছিলেন গবেষণার কাজে। এতবড় একজন বিজ্ঞানীর এত কাছের অনুভূতি—এ আমরা আর কোথায় পাব?

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানী হিসাবে কেন বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি পেলেন? পাঠ্যবইয়ে বসু সংখ্যায়নের কথা পড়ার

কার্জন হলের অদূরে অধ্যাপক বসুর বাসা (বর্তমানে লুপ্ত)

আগেই নিশ্চয় এ-সম্বন্ধে তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে। গত শতাব্দীটি যখন সবে শুরু হয়েছিল তখন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটেছিল কিছু বিরাট পরিবর্তন। গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানগুরু পদার্থবিদ্যার জন্য যেই ভিত্তি রচনা করেছিলেন স্কুলের বইয়ে, তোমরা তার মৌলিক কিছু জিনিস পড়ো।

শত-শত বছর ধরে এই চিরায়ত পদার্থবিদ্যা এমন নিখুঁতভাবে কাজ করেছে যে, একে মনে করা হতো একেবারেই নির্ভুল, অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে পদার্থবিদ্যা বাস্তবক্ষেত্রে কিছু সমস্যায় পড়ল। পরীক্ষার এমন কিছু ফলাফল দেখা গেল যা চিরায়ত পদার্থবিদ্যা দিয়ে কিছুতেই বোঝা সম্ভব হচ্ছিল না। এটি বিশেষভাবে দেখা দিল শক্তি বিকিরণের আচরণের ক্ষেত্রে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাংক এই বিপর্যয়ের মোকাবেলা করলেন সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্ব দিয়ে, যা পদার্থবিদ্যার ভিত নাড়িয়ে দিল। তিনি বললেন, চিরায়ত পদার্থবিদ্যা এতদিন আমাদের যেরকম বলেছে, বিকীর্ণ শক্তিকে সেরকম একটানা তরঙ্গ হিসাবে নিলে চলবে না। একে ভাবতে হবে শক্তির আলাদা কণিকা হিসাবে—যাকে বলা যায় শক্তির কোয়ান্টাম। এটিই কোয়ান্টাম তত্ত্ব। গোলমেলে ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করতে এই তত্ত্ব চমৎকারভাবে সমর্থ হল। আইনস্টাইন, নীল

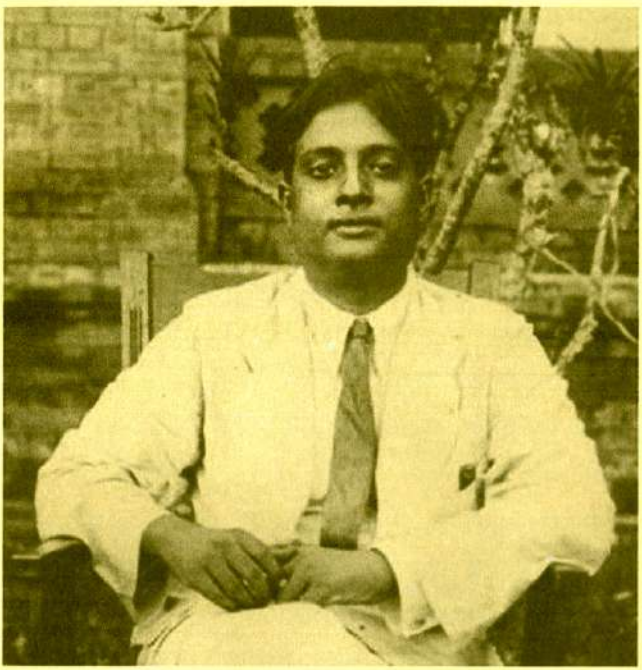

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ রিডার সত্যেন বসু

বোর–এঁরা এই তত্ত্ব ব্যবহার করে নতুন আলোড়ন আনলেন। কিন্তু গোড়ায় এর কিছু সমস্যা তবু রয়ে গেল।

প্ল্যাংক তাঁর তত্ত্বটি খাড়া করার জন্য একই সঙ্গে শক্তির তরঙ্গ ও কণিকা উভয় রূপের ধারণা ব্যবহার করেছিলেন। এতে তত্ত্বটির নিজের মধ্যেই খানিকটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছিল। তত্ত্বটি খুবই কাজে আসছিল বটে, বিজ্ঞানীর যৌক্তিক মন এতে তৃপ্ত হচ্ছিল না। তোমরা আইনস্টাইনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি তখন দুনিয়ার সবচাইতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। তিনিও চেষ্টা করছিলেন ওই অসঙ্গতি দূর করতে আরো অনেক বিজ্ঞানীর মতো। কিন্তু কিছুতেই সেটি সম্ভব হচ্ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখন একেবারে তরুণ। এম.এসসি. পাস করার পর তিন-চার বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তারপর নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন বছর দুয়েক আগে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের অসঙ্গতি দূর করার একটি চমৎকার সমাধান তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন। এটি বোঝার জন্য সংখ্যাগণিতের একটি নতুন কৌশল তিনি দিলেন। সেটিই 'বসু সংখ্যায়ন' নামে পরে বিখ্যাত হয়েছে। বসু তাঁর কৌশলে বিকিরণ শক্তিকে আগাগোড়া কণিকা বা কোয়ান্টাম হিসাবেই ব্যবহার করলেন। যে যুক্তিটির প্রয়োগ করে তিনি শক্তি

PHYSICS DEPARTMENT.
Dacca University.

Dated, the 4th June 1924.

Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that (I have tried to deduce the coefficient $\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$ in Planck's Law independent of the classical electrodynamics,) only assuming ~~the finite~~ that the ultimate elementary regions in the Phase-space has the content $h^3$. I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in Zeitschrift für Physik. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting only by your teachings through your writings. I do not know whether you still remember that somebody from Calcutta asked your permission to translate your papers on Relativity in English. You acceded to the request. The book has since been published. I was the one who translated your paper on Generalised Relativity.

Yours faithfully
S.N. Bose

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে লেখা (৪ জুন ১৯২৪) আইনস্টাইনকে সত্যেন বসুর সেই বিখ্যাত চিঠি যাতে তিনি নিজের আবিষ্কারের উল্লেখ করে প্রবন্ধটি প্রকাশে তাঁর সহায়তা চেয়েছেন

কণিকার মূল ভিত্তির পরিবর্তন ঘটালেন—তা সহজ, কিন্তু চমকপ্রদ। তিনি দেখালেন, শক্তি-কণিকারা পরস্পর একই রকম হওয়ার ফলে বণ্টনের গণনার সময় তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। এতেই কোয়ান্টাম তত্ত্বকে দাঁড় করাবার জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া গেল।

১৯২৪ সালের কথা। ঢাকা তখন ব্রিটিশ-ভারতের এক প্রান্তে ছোট একটি শহর। এর বিশ্ববিদ্যালয়টিও একেবারেই নতুন। আর বিজ্ঞানী হিসাবেও তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তেমন কোনো পরিচিতি নেই। কিন্তু নিজের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। তাই তাঁর আবিষ্কারটি তিনি লিখে ফেললেন মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার ছোট একটি নিবন্ধে। পাঠিয়ে দিলেন আইনস্টাইনের কাছে, তাঁর মতামত চেয়ে একটি ছোট চিঠিসহ।

সেই চিঠিতে বসু উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি আইনস্টাইনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হতে পারেন, তাই বলে তাঁকে সরাসরি এ অনুরোধ করে পাঠাতে বসুর কোনো দ্বিধা নেই। কারণ, তাঁর লেখা পড়ার মাধ্যমে বসু আইনস্টাইনের ছাত্র। শিক্ষকের কাছে ছাত্রের দ্বিধা থাকবে কেন?

দ্বিধা করেননি আইনস্টাইনও। তাঁর ওই অপরিচিত দূরের ছাত্রটির নিবন্ধ পড়েই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর মধ্যে সোনা আছে। তিনি নিজে নিবন্ধটি জার্মান ভাষায়

অনুবাদ করে সেরা একটি জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজের দুই লাইন মতামতও এর শেষে যোগ করে দিলেন :

> আমার মতে প্ল্যাংক সূত্র প্রমাণে বসুর পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতি আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টামবাদে প্রযোজ্য, যা আমি অন্যত্র দেখাব।

এভাবেই বসু সংখ্যায়নের জন্ম হল, আর বসুর নাম চলে গেল বিজ্ঞানের ইতিহাসে। নিজের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের এই শহরটিকে, এই জাতিটিকে সত্যেন বসু বিজ্ঞানের বড় ক্যানভাসে স্থান দিয়ে দিলেন।

আধুনিক পদার্থবিদ্যাকে বুঝতে গেলে বসু সংখ্যায়নকে বুঝতে হয়। বসু এটি আবিষ্কার করার পরপরই আইনস্টাইন এটি নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। এজন্য এটি বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন হিসাবেও কখনো-কখনো উল্লিখিত হয়। দেখা গেল, বসুর যুক্তি প্রয়োগ করা যায় এরকম সব কণিকার ক্ষেত্রেই বসু সংখ্যায়ন খাটানো হয়। এটি করে বিজ্ঞানের বহুতর বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এরকম সব কণিকাকে একটি সাধারণ নামও দেওয়া হয়েছে, 'বোসন'—যেহেতু এরা বসুর সংখ্যায়ন মানে। ভেবে দেখো, এটি একজন বিজ্ঞানীর প্রতি কত বড় সম্মান।

বসুর আবিষ্কারের তিন বছর পর এই সংখ্যায়নকে একটু

ভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করেছেন বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি। অন্য কিছু কণিকার আচরণ ভিন্ন বলে তাদের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতার প্রয়োজন হয়েছে। এটি ফার্মির সংখ্যায়ন, আর যেসব কণিকা এটি মানে তাদের সাধারণ নাম ফার্মিয়ন। দুনিয়ার সব কণিকা হয় 'বোসন' নইলে 'ফার্মিয়ন'।

শুরুতেই আমরা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বড় কাজটি সম্বন্ধে একটু জানার চেষ্টা করলাম। আমাদের এত বড় গর্বের বস্তু, এ নিয়ে খানিকটা জানতে তর সইবে কেন? এখন দেখা যাক কেমন করে বসু বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছিলেন তোমাদের মতো স্কুল-কলেজে পড়তে পড়তে। তারপর পড়াতে পড়াতে।

কলকাতা শহরে স্কটিশ চার্চ কলেজ অনেকেই চেনে। এর কাছে সাধারণ একটি গলি—ঈশ্বর মিল লেন। আজ এটি বিখ্যাত জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর বাড়ি হিসাবে। ১৮৯৪ সালে এই বাড়িটিই ছিল রেলওয়ে বিভাগের একজন অ্যাকাউন্টেন্ট সুরেন্দ্রনাথ বসুর। ওই বছর ১ জানুয়ারি সুরেন্দ্রনাথ আর তাঁর স্ত্রী আমোদিনী দেবীর জন্য এসেছিল খুবই মূল্যবান এক নববর্ষের উপহার এই বাড়িতে। সেদিন তাঁদের ছেলে সত্যেনের জন্ম হয়েছিল।

শহুরে ছেলে সত্যেন। দৌড়-ঝাঁপ করে বড় হবার সুযোগ পান নি। বাবা খুব বই পড়তেন। ওই অভ্যাসটি সত্যেনও পেয়েছিলেন। একটু বড় হয়ে অনেক সময় কাটত

দাবা আর ক্যারাম খেলে। অথচ স্কুলে তিনি সেরা ছাত্রদের একজন। তাঁর শিক্ষকরা বলেছেন, সত্যেনের পড়াশোনা আপন জগতে চলত। বিশেষ করে গণিতে তাঁর কোনো তুলনা ছিল না। জ্যামিতির অতিরিক্ত উপপাদ্যগুলো প্রত্যেকটি দু'তিনভাবে সমাধান করে তিনি শিক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিতেন। সত্যেনদের বাড়িতে বিজলি বাতি তখনো আসেনি। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি পড়তেন রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে।

এখন স্কুলের যে শেষ পরীক্ষাটিকে আমরা এসএসসি বলি তখন তাকে বলা হতো 'এন্ট্রান্স'। এই পরীক্ষায় পঞ্চম হয়েছিলেন সত্যেন বসু। এর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত অবশ্য তিনি প্রথম ছাড়া আর কিছু হন নি। ক্লাসে কিন্তু তাঁকে নিয়ে অধ্যাপকদের কোনো শান্তি ছিল না। নানা জটিল প্রশ্ন করে তাঁদের বিব্রত করার অভ্যাস ছিল বসুর। অধ্যাপকরা তাঁকে কাছে, চোখের সামনে বসাতেন, দূরে বসাতে সাহস করতেন না তাঁর দুষ্টুমির ভয়ে। পড়ার বিষয়গুলো সবসময় ছিল তাঁর পূর্ণ আয়ত্তে।

ছোটবেলায় বসুর চাঞ্চল্যের খানিকটা গিয়েছে টুকটাক যন্ত্রপাতি বানাবার খেয়ালে। তাঁর তখনকার এক বন্ধু লিখেছেন :

> একদিন বললেন আমাকে, একটা টেলিস্কোপ বানানো যাক, এসো। আমি খুঁজে দুটি কুব্জপৃষ্ঠ ম্যাগনিফায়ার লেন্স কিনে

আনলাম এবং একটি টিন মিস্ত্রিকে দিয়ে চোঙা বানিয়ে টেলিস্কোপ খাড়া করলাম। তার বিবর্ধন পাঁচ-ছয় গুণ হয়েছিল, কিন্তু লেন্স অপরিশোধিত হওয়াতে প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখাত। আর একদিন একটা পকেট ইলেকট্রিক বাতি এনে বললেন, এর ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে গেছে, একটা ব্যাটারি তৈরি করে বাতিটা জ্বালাতে হবে। মশলা জোগাড়পাতি করে এনে মাটির সেল বানিয়ে ব্যাটারি তৈরি করা গেল, আলোও জ্বলল, কিন্তু নিষ্প্রভ ও অল্পস্থায়ী হল।

আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো কোনো সৃষ্টিকারের সঙ্গে বসুর সাক্ষাৎ ঘটেছিল স্কুল শেষ করে কলেজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতায় সেদিনের প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন সমবেত হয়েছিলেন দেশের সেরা কিছু বিজ্ঞানী যাঁরা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ থেকেই এই দিকে দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন রেডিয়ো আবিষ্কারের কথাই ধরা যাক। ওই সময়টায় ইতালিতে মার্কনি, ইংল্যান্ডে অলিভার লোজ এবং কলকাতায় জগদীশচন্দ্র বসু বেতার তরঙ্গের প্রথম ব্যবহার জনসমক্ষে এনেছিলেন—এক একজন এক এক ভাবে। জগদীশ বসু এটি করছিলেন ওই প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর ক্লাসরুমে একটি সুইচ টিপে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—যা পুরো দালান ভেদ করে এর অন্য প্রান্তে দর্শকের সামনে ঘণ্টা বাজিয়েছে এবং ছোট বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তিনি যে ধরনের রেডিয়ো সম্প্রচারক ও গ্রাহক যন্ত্র এজন্য উদ্ভাবন

করেছিলেন তা পরে অন্যরা খবর আদান-প্রদানের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়েছিলেন। জগদীশ বসুর পরবর্তী গবেষণাগুলো স্বচক্ষে দেখেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্র সত্যেন বসু। ওই সময় এই কলেজে রসায়ন বিভাগে আর এক জগৎ রচনা করছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনিও কিন্তু রসায়ন শুধু পড়াচ্ছিলেন না—এতে নতুন সৃষ্টিও করছিলেন এবং তাও করছিলেন দেশের সম্পদ ও সম্ভাবনার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে। সত্যেন বসু ও তাঁর সহপাঠীরা বিজ্ঞান পড়ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের এমনি অগ্রবর্তী আবহে। তাঁর নিজের আগ্রহ বেশি ছিল গণিতে এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাঁদের ছাত্রাবস্থার সময়টিতেই পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছিল যা তখনো পাঠ্যপুস্তকে আসেনি। কিন্তু সত্যেন বসুর মনোযোগ তখন থেকেই সেই যুগান্তকারী বিষয়গুলোর দিকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা এম.এসসি.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে যখন বেরোলেন তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। ভাবছ বুঝি এমন ভালো ছাত্র, এমন পরীক্ষার ফল, এমন উঁচু ডিগ্রি, চাকরি-বাকরি সব কিছুর দুয়ার খুলে যাবে। না, তা হয় নি। প্রথম এক বছর তো ঘরে ছাত্র পড়িয়েই কাটল। তারপর অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে চাকরি মিলল—পদার্থবিদ্যা আর মিশ্র

গণিত পড়াবার জন্য।

ওই ব্যাপারটিও কিন্তু একটি নতুন ঘটনা। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পর্যন্ত বিজ্ঞান পড়ানো বা বিজ্ঞান-গবেষণার ঐতিহ্য ছিল না। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য হিসেবে ঠিক করলেন এটি করতে হবে। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা হলো। কলেজটিকে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার ও চর্চার উপযোগী করার জন্য উপাচার্য বিশেষ দায়িত্ব দিলেন নতুন কয়েকজন প্রভাষককে। সত্যেন বসু হলেন তাঁদের অন্যতম।

পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেসময় অনেক ওলটপালট হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে হলে এসব সর্বশেষ খবর জানা চাই। শুধু লেখাপড়া করেই এসব জানলেন না বসু, নিজেও গবেষণা শুরু করলেন। এসব কাজের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসাবে পেলেন মেঘনাদ সাহাকে। যাঁর জন্ম ঢাকা জেলায়, ঢাকা কলেজে পড়েছেন কিছুদিন। পরে কলকাতায়। সেখানে তিনি সত্যেন বসুর সহপাঠী হন। উভয়ের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব, আর ফার্স্ট হওয়ার প্রতিযোগিতা। চাকরিতেও দু'জনে ঢুকেছেন একই পদে একই সঙ্গে। গবেষণাও শুরু করলেন একযোগে। সেই কাঁচা বয়সে দুই বন্ধুর গবেষণার ফল নিয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো লন্ডনের অত্যন্ত উঁচুদরের বিজ্ঞান পত্রিকা *ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে*। এরই মূল বিষয়

পরে 'সাহা-বসু অবস্থা সমীকরণ' নামে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। মেঘনাদ সাহাও খুবই বড় মাপের বিজ্ঞানী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন তাঁর নানা কাজ ও আবিষ্কারের জন্য। তাঁরও খ্যাতি হয়েছিল বিশ্বজোড়া।

কিন্তু এসব আরো একটু পরের কথা। তার আগে সম্পূর্ণ যুগান্তকারী নতুন পদার্থবিদ্যার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হতে হলো দুই তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন বসু ও মেঘনাদ সাহাকে। এসবের অধিকাংশ ঘটছিল জার্মানিতে, দুর্দান্ত সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে জার্মান ভাষার সাময়িকীগুলোতে। তাই তাঁরা জার্মান ভাষা শেখায় মন দিলেন। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় নিজে নিজে এই ভাষা শেখার প্রয়াস চলল। পদার্থবিদ্যার একেবারে সম্মুখ সীমান্তে কী দারুণ আবিষ্কারগুলো হচ্ছে তা তাঁরা সরাসরি অনুধাবন করতে পারলেন। শুধু তাই নয়, অন্যরাও যেন তা পারে সে চেষ্টাও নিলেন। সেটি ১৯১৯ সালের কথা। জার্মানিতে আইনস্টাইন তখন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব সম্পূর্ণ খাড়া করে এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দিয়ে পদার্থবিদ্যার ভিতকে নতুন করে গড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো জার্মান ভাষার বাইরে তাঁর কাজগুলো প্রকাশিত হয়নি। বসু আর সাহা এই দায়িত্ব নিয়েনিলেন। আইনস্টাইনের বিজ্ঞান-বিষয়কপ্রবন্ধগুলোকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করে তাঁরা বই প্রকাশ করলেন।

ইংরেজি ভাষায় আইনস্টাইনের লেখা প্রকাশে এটি সম্ভবত প্রথম প্রয়াস। এটি করতে গিয়ে আইনস্টাইনের কঠিন সব গাণিতিক ও ধারণাগত নতুন আবিষ্কার তাঁদেরকে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হয়েছিল। ভবিষ্যতে যে আবিষ্কার সত্যেন বসুকে বিশ্বখ্যাত করেছে সেই সংখ্যায়ন বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও পড়াশোনা এসময়েই পুরোপুরি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সায়েন্স কলেজের উচ্চতর পদার্থবিদ্যা শিক্ষার উপযুক্ত আয়োজন গড়ে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরকে দিয়েছিলেন। লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরিতে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করে তাঁরা চেষ্টা করলেন কলেজটিকে বিশ্বমানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে।

এসবের তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি মেঘনাদ সাহাই প্রথমে ভালোভাবে পেলেন। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি নামে সে যুগের একটি সেরা বৃত্তি লাভ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে উচ্চ গবেষণার জন্য ইউরোপ চলে গেলেন, আর ডক্টরেট ডিগ্রি ডি.এসসি.'র জন্য থিসিস পেশ করলেন। এদিকে সত্যেন বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আগের অবস্থাতেই থেকে গেলেন। দুই বন্ধুর কাজ এভাবে আলাদা হয়ে গেলো বটে, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ও বিজ্ঞান-চর্চায় পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করা ও পরামর্শ দেওয়া অব্যাহত থাকে। পরে সত্যেন বসু যখন ঢাকায়, তখন তিনি প্রায়ই পরীক্ষা

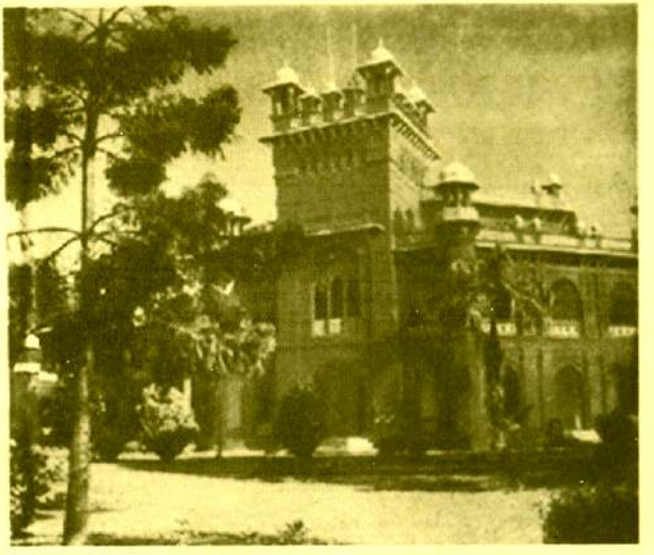

সত্যেন বসুর গৌরবময় কালের কর্মস্থল
কার্জন হলে পদার্থবিদ্যা বিভাগ (১৯২১)

ইত্যাদি উপলক্ষে সাহাকে আমন্ত্রণ করে আনতেন। আর সাহার বাড়ি তো ঢাকায়; তাই বাড়ি আসা, বন্ধুর দেখা পাওয়া এসব কারণে তিনি আমন্ত্রণ লুফে নিতেন। আইনস্টাইনের সঙ্গে সত্যেন বসুর বিখ্যাত কাজটির পর মেঘনাদ সাহাই ঢাকায় এসে এ নিয়ে নতুন নতুন সমস্যার দিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং গাণিতিকভাবে এর সমাধানে উৎসাহিত করতেন। সে-সব অবশ্য কিছুটা পরের কথা। এখন মেঘনাদ সাহা উচ্চতর সুযোগ পেয়ে বিদেশে চলে গেলেও সত্যেন বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একই ধরনের সুযোগ চেয়ে ব্যর্থ হলেন। তাঁকে সায়েন্স কলেজে রেখে দেবার জন্য উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শুধু কিছু বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করলেন। কিন্তু বসু চান গবেষণার সুযোগ, উচ্চতর কাজের সুযোগ।

এর মধ্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হচ্ছিল ঢাকায়। এখান থেকে ডাক পেয়ে সত্যেন বসু ১৯২১ সালে চলে এলেন ঢাকায়। তারপর প্রায় দুই যুগ কাটিয়ে ১৯৪৫ সালে কলকাতায় চলে যাবার আগে পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে গৌরবময় দিনগুলো কাটিয়ে গেলেন এখানে। পদার্থবিদ্যার ইতিহাসের সত্যেন বসু, কিংবদন্তির সত্যেন বসু আসলে ঢাকারই সত্যেন বসু। এখানে অবশ্য সাধারণত তাঁকে সত্যেন বসু বলা হতো না, সবাই বলত বোস সাহেব। কত

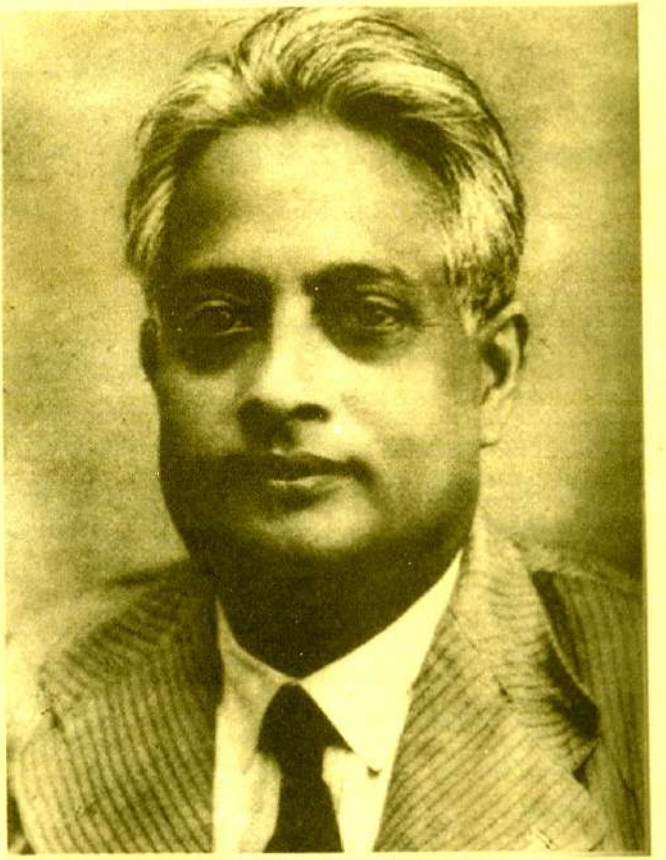

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার
বিভাগীয় প্রধান সত্যেন বসু

গল্প বোস সাহেবকে নিয়ে। আমাদের শিক্ষকদের কেউ-কেউ তাঁর ছাত্র ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁদের মুখে কত শুনেছি সত্যেন বসুর কাহিনী। তার চেয়েও বেশি শুনেছি ল্যাবরেটরির প্রবীণ দুএকজন কর্মীর কাছে—যাঁরা বোস সাহেবের সময়েও কাজ করতেন।

বোস সাহেব ছিলেন সবার কাছে জ্ঞানের রহস্যপুরীর এক রহস্যপুরুষ। তাঁকে নিয়ে গল্প মুখে-মুখে প্রচলিত থাকবে, এই তো স্বাভাবিক। কার্জন হলের পশ্চিমের সিঁড়ির পাশের ঘরটিতে ছিল তাঁর ল্যাবরেটরি। সেখানে নাকি দিনরাত আলো জ্বলত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ছাত্র, সাধারণ মানুষ অনেকেরই কৌতূহল হতো, কাচের শার্শি দিয়ে উঁকি মেরে এক নজর দেখতে চাইতেন বোস সাহেবকে। দু'কদম দূরে বাসা হলেও দুপুরের খাবার তাঁর কার্জন হলেই আসত—রেকাবিতে কাপড়-ঢাকা হয়ে। কখনো-কখনো রাতের খাবারও আসত এখানেই।

কোনো-কোনো গল্প হয়তো খানিকটা বাড়িয়েই বলা হয়। কিন্তু তাতে বোঝা যায় সবাই বোস সাহেবকে কীভাবে জানত। সত্যেন বসুর ছেলেকে একদিন স্কুলে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করল, খুশিটা কী জন্য? ছেলে বলল, খুশি হব না, বাবা যে আজ নিজ থেকে বাড়িতে গিয়ে ভাত খেয়েছেন। সাধারণত তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে ভাত খাওয়ার কথা মনে করানো হতো।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্র বা তরুণ এক সহকর্মী তাঁর অনুপস্থিতিতে হন্যে হয়ে তাঁর ফেলে দেওয়া কাগজের বাস্কেট ঘেঁটেছে এমন জনশ্রুতি আছে। বসুর অবশ্য ঠিকই অভ্যাস ছিল, একের পর এক কাগজে আপন মনে অঙ্ক করার, আর কিছুক্ষণ পরেই তা ফেলে দেয়ার। জীবনের একেবারে শেষ দিনগুলোতেও যাঁরা তাঁকে কলকাতার ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে দেখতে যেতেন, তাঁরাও দেখেছেন তিনি বিছানায় শুয়ে কাগজে আঁক কষছেন।

এত বড়, এত ব্যস্ত বিজ্ঞানী—তবুও ছাত্র বা সহকর্মী কেউ পদার্থবিদ্যার কোনো সমস্যা, কোনো অংক নিয়ে এলে সঙ্গে-সঙ্গে লেগে পড়তেন তা নিয়ে। তোমরা জানো, কাজী মোতাহার হোসেন আমাদের দেশের একজন অতি বরেণ্য চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি সে-সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তরুণতর সহকর্মী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'জিনসের বইয়ের সাড়ে তিনশ' অঙ্কের মধ্যে প্রায় ১০০টা তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলাম।' আর একবারের কথা কাজী সাহেব লিখেছেন :

> অঙ্কটা করতে আরম্ভ করলেন, কিছুই মেলে না। এইভাবে সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল গেল, অঙ্ক হয় না। রাত ১২টার ঘণ্টা বেজে গেল, তখন তিনি বললেন, 'চলো আমাদের বাড়িতে। চলো, সেখানে ম্যাক্সওয়েলের বই আছে।' দেখা গেল প্রমাণটার মধ্যে রয়েছে একটি পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব, সেকথাটি আমাদের কারোরই মনে হয় নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসুর নেতৃত্বে গবেষক-বিজ্ঞানীর বেশ একটি উচ্চমানের গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে পরে বড় বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি পেয়েছেন। তিনি নিজে ছিলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, গণিতেই ঝোঁক বেশি। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে গবেষণা, সেখানেও তাঁর ছিল সমান দখল। ওই যে ছেলেবেলায় যন্ত্র তৈরি করতে আনন্দ পেতেন, সেই উৎসাহ তাঁর কখনো যায় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন হতো তার অনেকগুলোই ছিল সে-দিনের বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বিষয়ে। সহকর্মী বিজ্ঞানীরা এর অনেক যন্ত্রপাতি নিজেরাই বানিয়ে নিতেন। এসব যন্ত্রপাতির অনেকগুলোতে থাকত সত্যেন বসুর ভাবনা আর কুশলতার ছোঁয়া। আজও কার্জন হলের কোনো-কোনো ল্যাবরেটরিতে তাঁর তৈরি করানো পুরোনো ভাঙা যন্ত্র দেখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে সত্যেন বসুর উপস্থিতি ও নেতৃত্ব একে সারা ভারতের সবচেয়ে সফল পদার্থবিদদের জন্য একটি চুম্বকের মতো কাজ করল। কে এস কৃষ্ণান, কেদারেশ্বর ব্যানার্জি, এস আর খাস্তগীর এবং এস এম মিত্রের মতো প্রতিভাবান পদার্থবিদ সে-যুগে এখানে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন এক্সরে

কেলাস বিদ্যা, বেতার ও ইলেকট্রনিক্স, কেলাস চুম্বকত্ব, রমন বিক্রিয়া, জ্যোতির-পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি অত্যন্ত অগ্রবর্তী, বলতে গেলে নতুন সৃষ্টি হওয়া এক-একটি বিষয়ের দিকপাল—বিশ্বমানের বিজ্ঞানী। বলতে গেলে এটি ছিল এই পদার্থবিদ্যা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি সোনালি যুগ। তাত্ত্বিক গবেষণা, পরীক্ষণ গবেষণা, যন্ত্র তৈরি সব রকমের দিক থেকে ব্যস্ত ও মুখর একটি সময়। বিশ্ব-পদার্থবিদ্যার মানচিত্রে আমাদের এই বিভাগটি এখন জ্বলজ্বল হয়ে চিহ্নিত রয়েছে। এর প্রভাব ছাত্রদের ওপরও পড়তো। সত্যেন বসু তাঁর খ্যাতনামা এসব সহকর্মীর কাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকতেন, নিজের গবেষণার বিষয়গুলো তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে তো বটেই, উচ্চতর শ্রেণির ছাত্রদের সঙ্গেও আলোচনা করতেন। প্ল্যাঙ্কের যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব, তাকে একটি প্রয়োজনীয় প্রকল্প হিসেবে শুধু যেভাবে ধরে নেয়া হয়েছিল সেটি বসুর পছন্দ হয়নি। তিনি একে একটি গাণিতিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই ইচ্ছেটা থেকেই তাঁর সেই বিখ্যাত বসু সংখ্যায়নের সৃষ্টি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম বিদেশে গিয়েছেন তাঁর সেরা কাজটি করে বিখ্যাত হবার পর, ১৯২৪ সালে। সেবার প্রায় দু'বছর কাটালেন ইউরোপে। প্যারিসে মাদাম কুরির সঙ্গে কিছুদিন কাজ করলেন তাঁর রেডিয়াম ইন্সটিটিউটে।

পথিকৃৎ মহিলা বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের আবিষ্কারক মাদাম কুরির কথা তোমরা সবাই জানো। ইতোমধ্যে ফরাসি ভাষা বসুর বেশ শেখা হয়ে গিয়েছিল। তাই অসুবিধা হয়নি ফ্রান্সে কাজ করতে।

মাদাম কুরি বিখ্যাত ছিলেন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিষয়ে কাজের জন্য—এ কাজে তাঁর ল্যাবরেটরি সবার সেরা। সত্যেন বসু এখানে স্বয়ং মাদাম কুরির কাছ থেকে শেখেন তেজস্ক্রিয়তার সর্বশেষ পরীক্ষণ-কৌশলগুলো এবং একে নিয়ে একটি সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কাজও করেন। ফ্রান্সের খ্যাতনামা প্রবীণ বিজ্ঞানী লাজেঁভি তখন আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন। সত্যেন বসুকে পেয়ে তাঁকেও তাঁর সাম্প্রতিকতম গবেষণায় শরিক করেন। একইভাবে তিনি হাতে-কলমে কাজ করেন এক্স-রে-র মাধ্যমে কেলাস বা স্ফটিকের মধ্যে অণুগুলো কেমন ভাবে সাজানো থাকে তা উদ্ঘাটনের পদ্ধতি সম্পর্কে। ওই যে বলেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে তিনি বিশ্বমানের অন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও শিক্ষকতার সঙ্গে সেসব বিষয়েও নিজের অবদানটি যোগ করতে পারতেন; বিভাগীয় প্রধান হিসেবে শুধু প্রশাসনিক নেতৃত্ব নয়, নানা গবেষণায় বৈজ্ঞানিক নেতৃত্বও দিতে পারতেন। তার কারণ এসব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং ইউরোপে থাকতে এসবে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন।

বসুর আসল গন্তব্য অবশ্য ছিল বার্লিন, আইনস্টাইনের জায়গা। দূর থেকে যাঁকে শিক্ষক মেনেছিলেন, সেই আইনস্টাইনের সঙ্গে, কাছে থেকে কাজ করবেন এটি বসুর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। আইনস্টাইনের মাধ্যমে তিনি জার্মানির সেরা বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ-সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রফেসরের পদ খালি হলে বসু বিদেশ থেকেই দরখাস্ত করলেন। বড় কাউকে দিয়ে সুপারিশ করাতে পারলে ভালো হয়, তাই আইনস্টাইনকে বললেন কথাটা। এতে আইনস্টাইন অবাক হয়ে বলেছিলেন–'সে কী, তুমি বিজ্ঞানের জন্য যা করেছ, তাই কি সবচেয়ে বড় সুপারিশ নয়?' অবশ্য সুপারিশ তিনি দিয়েছিলেন। তাতে বসু সম্পর্কে অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখেছেন, 'আমরা সবাই তাঁর উপস্থিতিতে উপকৃত হয়েছি।' সেদিনের পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থলের একটি–বার্লিনের বিজ্ঞানীরা এবং স্বয়ং আইনস্টাইন উপকৃত হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বসুর উপস্থিতিতে–এর চেয়ে বড় প্রশংসাবাণী আর কী হতে পারে!

বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে বসুর নিয়মিত দেখা হয়েছে। গবেষণা এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে অনেক আলাপ হয়েছে; কিন্তু আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর কাজ করা হয়নি। এ সময় আইনস্টাইন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের চেষ্টার কাজ

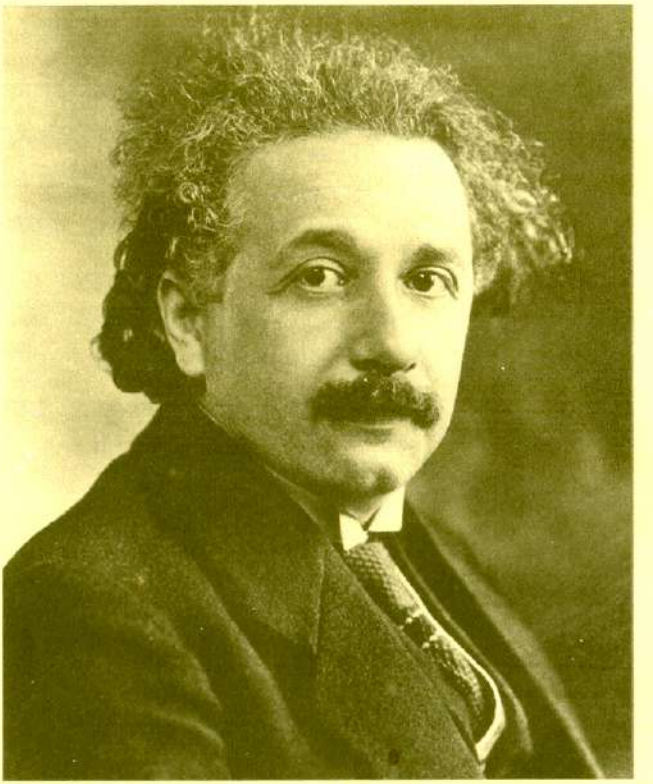

আলবার্ট আইনস্টাইন
দূর থেকে যাঁকে শিক্ষক মেনেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু

করছিলেন—যাতে শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন নি। বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে অভিকর্ষ ক্ষেত্রকে একই তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ছিল এই একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব। তাঁর জীবনের আরো পরের দিকে সত্যেন বসু নিজেও এই চেষ্টায় শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু ওই যৌবনে ইউরোপ সফরের সময় বার্লিনেও সত্যেন বসু ডিগ্রির জন্য উপযুক্ত কোনো একটি বিষয়ে গবেষণায় কেন্দ্রীভূত থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি ইত্যাদির চেষ্টা না করে বরং বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা, চর্চা ও সে যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এতে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে গতানুগতিক নিয়ম অনুসরণে তাঁর পদোন্নতি ইত্যাদিতে সাময়িক সমস্যা হয়েছে বটে কিন্তু পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভিন্ন অগ্রবর্তী বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে খুবই কাজে এসেছে। তাঁর যে প্রতিভা তাতে তিনি অনায়াসে অল্প সময়ে নিজের ডিগ্রির কাজটি করতে পারতেন, যে প্রতিভার পরিচয় তিনি এর আগেই চমৎকারভাবে দিয়েছেন। একথা বলা যায় যে, সত্যেন বসু ছিলেন বহুমাত্রিক চিন্তার মানুষ, দীর্ঘদিন এক বিষয়ে মনোনিবেশ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

১৯২৭ সালে দেশে ফেরার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার অনেক বড়-বড় দায়িত্ব এসে পড়ল বসুর উপর। পদার্থবিদ্যার প্রফেসর, বিভাগের প্রধান, বিজ্ঞান অনুষদের

ডিন, ঢাকা হলের প্রভোস্ট—অনেক দায়িত্ব। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় যে পরিচয় গড়ে উঠল, তা হলো, কার্জন হলের সাধক বিজ্ঞানী বোস সাহেব—যে বোস সাহেবের কথা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, ঢাকা শহরের সাধারণ লোকদেরও খুব জানা ছিল।

চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে এখানে ছাত্র ছিলেন লেখক-অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম। তিনি লিখেছেন :

> আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু আর্টস কিংবা বিজ্ঞান কোনো জগতেরই এমন ছাত্র ছিল না যে সত্যেন বসুর নাম না জানত। হয়ত তখন বয়স ছিল চল্লিশের কোঠায়। কিন্তু পাতলা রেশমের মতো চুল কয়টি তখনই একেবারে শাদা হয়ে গিয়েছিল। চোখে পুরু কাচের চশমা।

ধুতি, হাফশার্ট, স্যান্ডেল পরা সাধাসিধে এক আত্মভোলা অধ্যাপকের ছবিতেই সত্যেন বসুকে দেখা যেত। কিন্তু গবেষণায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সংগঠনে, ছাত্রদের নিয়ম-নিষ্ঠা জানানোর ব্যাপারে কোনো কাজে তাঁর ভুল হতো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য খুব সচেতন থাকতেন তিনি। একবার চীনের এক অধ্যাপক এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা দেখতে। সালফোনেমাইড নামক রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির সহজ পদ্ধতি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব হয়েছে। বসু চীনা অধ্যাপককে এটি দেখিয়ে মুগ্ধ করলেন, সব খুঁটিনাটি তাঁকে দেখতে দিলেন। তাঁর মনে ছিল চীন দেশে কীভাবে

সয়াবিনের দুধ তৈরি হয় সেই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিটি অধ্যাপকের কাছ থেকে শিখে নেবেন। সয়াবিন আনা হলো, যথানিয়মে এর থেকে দুধ তৈরি হলো, দুধ থেকে ছানা। তোমরা হয়তো জানো যে, সয়াবিন খুব উঁচুমানের আমিষ খাদ্য। তবে এমনিতে এটি খেতে ভালো নয়। দুধ-ছানা তৈরি করে খেতে পারলে দেশে পুষ্টি সমস্যার একটি সুরাহা হতো।

শিক্ষকতা এবং গবেষণা—এই দুটি কাজকে সত্যেন বসু এক করে দেখতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকিরণ তত্ত্ব পড়াতে গিয়েই তাঁর কাছে বসু সংখ্যায়নের মূল কৌশলটি ভেসে উঠেছে—এ-কথা তিনি বলেছেন। শিক্ষকতা তাঁর কাছে ছিল একটি সৃষ্টিশীল কাজ। তাই তাঁর ক্লাস নেওয়ার সঙ্গে পরীক্ষা পাসের বা হুবহু পাঠক্রম ধরে এগোবার সম্পর্কটুকুই শুধু থাকত না; নিজে তিনি বিজ্ঞানকে মনের ভেতর থেকে গ্রহণ করেছিলেন, চাইতেন তাঁর ছাত্ররাও তা করুক। যেসব ছাত্রের উৎসাহ ছিল বিজ্ঞান-রহস্যের জগতে বিচরণের, তারা চুম্বকের মতো টান অনুভব করত বসুর ক্লাসে।

শিক্ষকতাকে ওভাবে নিতেন বলেই সত্যেন বসু নিজের ভাষায় বিজ্ঞান পড়ানো জরুরি মনে করতেন। কাজী মোতাহার হোসেনের কাছে আমরা জেনেছি যে, সেই ব্রিটিশ-ভারতের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসু বাংলায়

বিজ্ঞান পড়ানো শুরু করেন। শুধু নিজে পড়ান নি, কাজী সাহেবসহ অন্যান্য শিক্ষককে উৎসাহিত করেছেন বাংলায় পড়াতে। সে-সময় এটি অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ছিল। সেটা ইংরেজের যুগ, ইংরেজির যুগ। এমনকি স্কুলেও অধিকাংশ লেখাপড়া চলত ইংরেজিতে। নিজের সিদ্ধান্তে, নিজের চেষ্টাকে সম্বল করে তিনি বাংলায় পড়ানো শুরু করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার এই চর্চার প্রেরণাটি সত্যেন বসু অনুভব করেছিলেন কয়েকজন মনীষীর প্রভাবে এসে। বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ—বিশেষ করে এই তিনজনের দ্বারা প্রভাবিত হবার কথা বসু নিজেই বলে গেছেন। তিনি লিখেছেন :

> আমি যখন তাঁর (বঙ্কিমচন্দ্রের) 'বঙ্গে বিজ্ঞান' প্রবন্ধটি পাঠ করি তখন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বাংলাকে বৈজ্ঞানিক করতে হলে বাঙালিকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শেখাতে হবে—বঙ্কিম বাবুর এই কথাগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। তোমরা জানো না বোধ হয়, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকেই আমি এই সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম যে, আমাদের মাতৃভাষাকে উচ্চতর বিজ্ঞান আলোচনার বাহন করার জন্য আমি আত্মনিয়োগ করব। আমার দু'জন শিক্ষকই—জগদীশচন্দ্র ও প্রফুলচন্দ্র এই ভাবের ভাবুক ছিলেন।

সত্যেন বসুকে আরো বড় প্রেরণা জুগিয়েছিলেন

রবীন্দ্রনাথ। সাতাত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে সুন্দর ও সহজ বই লিখলেন—'বিশ্বপরিচয়'। এই বই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে। এই প্রসঙ্গে বসু বলেছেন, 'আমার মনের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড প্রেরণা অনুভব করলাম।'

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অন্যরা 'বিজ্ঞান পরিচয়' দ্বিমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নিলে রবীন্দ্রনাথ একে আশীর্বাদ করে তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন :

> প্রকৃতির সঙ্গে সত্য পরিচয় না থাকলে জীবনযাত্রায় মূঢ়তার দ্বার অবারিত থাকে। সকল প্রকার অন্ধ বিশ্বাস অবাধে সমাজের ভাবনা কল্পনা ও ক্রিয়াকলাপকে অধিকার করে বসে। প্রকৃতির সঙ্গে তার সত্য ব্যবহার ভ্রষ্ট হয়ে মানুষকে পদে পদে অকৃতার্থ করে দেয়।
>
> আমাদের দেশের দুর্গতির দৃষ্টান্ত চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। আমাদের অধিকাংশ পরাভবের মূল এই অজ্ঞানতার মধ্যে, অথচ মোহাবিষ্ট মন তার যথার্থ কারণ বুঝতে পারে না। এই জন্য আমি মনে করি দেশকে বিজ্ঞান-শিক্ষায় অভিষিক্ত করে দেওয়া তার সফলতার সাধনের উদ্দেশে একটি মহৎ কর্তব্য। এই অধ্যবসায়ে বিজ্ঞান-পরিচয় দ্বৈমাসিক পত্রখানি যথেষ্ট সহায়তা করবে সন্দেহ নেই, আমি সর্বান্তঃকরণে তার প্রতিষ্ঠা কামনা করি।
>
> ২৮.৮.৪০

শান্তিনিকেতনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথ যাঁদেরকে জানাতেন, আমন্ত্রণ করতেন, তাঁদের

মধ্যে ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৭ সালের ৫ এপ্রিল এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন যে, সামনের ১লা বৈশাখে আশ্রমে চীন-ভবনে গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান হবে, তাতে তিনি নিমন্ত্রিত। সেইসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, এই উপলক্ষে চীনের কনসাল উপস্থিত থাকবেন, জহরলাল নেহেরু থাকবেন। মহাত্মাজিকে (গান্ধি) নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তিনি থাকতে পারছেন না।

ক্লাসে বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানো ছাড়াও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য আরো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বসু। ১৯৪১ সালে ঢাকা থেকে তিনি একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা 'বিজ্ঞান পরিচয়' প্রকাশ করতে শুরু করেন। এতে নিজে বিজ্ঞান বিষয়ে লিখলেন, আর সহকর্মীদের উৎসাহিত করলেন লিখতে।

১৯৪৫ সালে সত্যেন বসু ঢাকা ছেড়ে যান। তিনি চলে যাবার পর এখানে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কাজ খানিকটা থিতিয়ে পড়লেও তাঁর কোনো-কোনো উত্তরসূরি এটি চালু রেখেছিলেন। বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানো, বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা, পত্রিকা প্রকাশ—পথিকৃৎ সত্যেন বসুর এই প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন কাজী মোতাহার হোসেন ও শাহ ফজলুর রহমান প্রমুখ। এই ধারাই ক্রমে-ক্রমে আরো বলিষ্ঠ হয়েছে আমাদের দেশে।

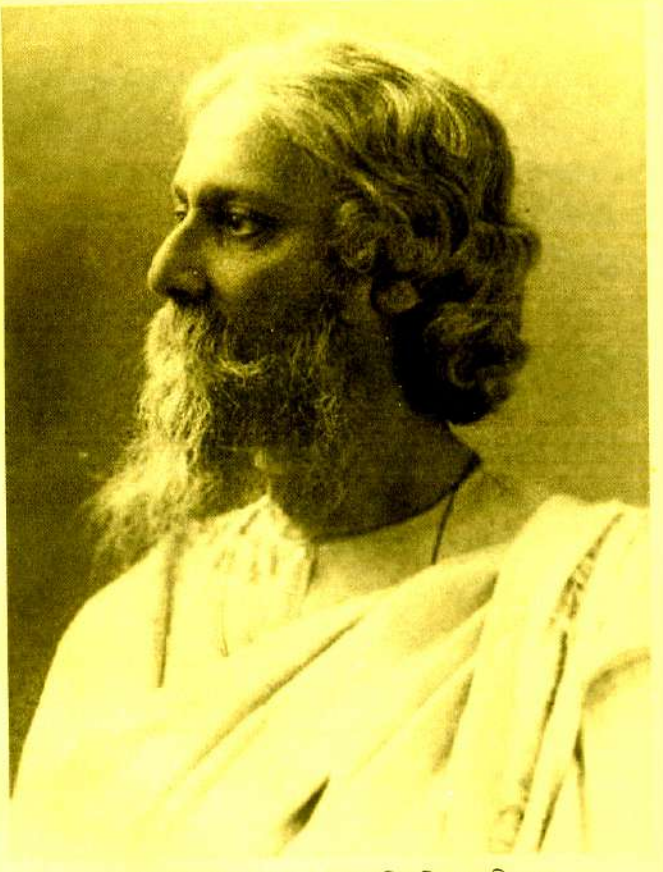

সত্যেন বসুকে আরো বড় প্রেরণা জুগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ

কলকাতায় গিয়ে সত্যেন বসু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। ওখানে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কিছু স্থায়ী আয়োজন হলো। পরিষদের মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সেই তখন থেকে আজও চলছে। চলছে পরিষদের অন্যান্য কাজও।

এসব কাজ সত্যেন বসুর জন্য সহজ হয়নি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার রীতি চালু করতে গিয়ে তিনি বাধা পেয়েছেন নানাভাবে। তাঁকে এ নিয়ে বিবাদ করতে হয়েছে শুধু বিদেশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নয়, স্বজাতির বহু নামি-দামি লোকের সঙ্গেও। এ-সম্পর্কে নানা বাজে অজুহাত তাঁকে খুব বিরক্ত করত। এ-জন্যই তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান জানেন না।'

ঢাকা থেকে চলে যাবার পর ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬—এই বারো বছর সত্যেন্দ্রনাথ বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এখান থেকে অবসর নেবার পর দু'বছর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে বসুকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এলাহাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে একই সম্মানে ভূষিত করে। এর পরের বছর লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলো

মনোনীত করে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' ও 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে। এ-সময় ভারতের জাতীয় অধ্যাপকের পদে তাঁকে বরণ করা হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই সম্মানের পদে আসীন থেকে বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বসু সংখ্যায়নই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে কলকাতায় পদার্থবিদ্যার আরো বিভিন্ন শাখা তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। কঠিন বস্তুর পরমাণুগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়ে এর স্ফটিক বা কেলাস গঠন করে। বস্তুর থেকে এক্স-রে কীভাবে ঠিকরে আসে তার মাধ্যমে ওই কেলাসের গঠন জানা যায়। এ-সম্পর্কে নানা পরীক্ষণের কাজ বসু করেছেন। বস্তুর সঙ্গে আলোর পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ে আবিষ্কারের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ওই আবিষ্কারটিকে 'রমন প্রক্রিয়া' বলা হয়। এই রমন প্রক্রিয়া যে এক্স-রে'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা ঢাকায় বসুর ল্যাবরেটরিতেই প্রমাণিত হয়। এখানে এক্স-রে'র বর্ণালি বীক্ষণের যে অতি সূক্ষ্ম সুগ্রাহী যন্ত্র তিনি তৈরি করিয়েছিলেন তা বিদেশেও বিজ্ঞানী মহলে সমাদর পেয়েছে।

১৯২৪ সালে প্রথম বিদেশ যাওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বহুবার বিদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান সম্মেলনে তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণার কাজগুলো উপস্থাপন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজেও তাঁর বিভিন্নমুখী পরীক্ষা ও তাত্ত্বিক কাজের বিরাম ছিল না। উদাহরণস্বরূপ—১৯৫৪ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক স্ফটিক তত্ত্ব সম্মেলনে তাঁর উদ্ভাবিত বর্ণালি ফটোমিটার যন্ত্র উপস্থাপন করে তিনি খুবই প্রশংসিত হন। বসুর কাজ পদার্থবিদ্যাকে অতিক্রম করে রসায়ন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার পরীক্ষণেও বিস্তৃত হতো।

কিন্তু পরীক্ষণে উৎসাহ ও সাফল্য সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু মূলত ছিলেন একজন তাত্ত্বিক। গণিতের মাধ্যমে পদার্থবিদ্যার মূল সূত্রগুলোকে সুন্দরভাবে ধারণ করাই ছিল তাঁর বরাবরের স্বপ্ন। বসু সংখ্যায়ন তারই ফল। বিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তির এই তাত্ত্বিক ভাবনা তাঁকে কখনো ছেড়ে যায়নি।

আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা তোমরা শুনেছ। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে আইনস্টাইন মহাকর্ষ বলকে একটি সুন্দর সাধারণ গাণিতিক ভিত্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাকর্ষ বলই বিশ্বের একমাত্র বল নয়। তড়িৎ-চৌম্বক বলের কথাও আমরা অনেকদিন ধরে জানি। পরে সবল ও দুর্বল দু'রকমের নিউক্লিয়ার বলের কথাও আমরা জেনেছি। এর প্রত্যেকটি যার-যার নিজস্ব নিয়মে

সংঘটিত হয়। তাই পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। জীবনের শেষ দিকে আইনস্টাইনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, মহাকর্ষ ও তড়িৎ চৌম্বক-বলকে একই সাধারণ সূত্রের আওতায় আনবেন। এটাই আইনস্টাইনের বহু গবেষণার লক্ষ্য একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আইনস্টাইন এবং আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী এ বিষয়ে কাজ করেছেন। সত্যেন বসুও এ-কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বসু শেষ সাফল্য এতে অর্জন করেননি, স্বয়ং আইনস্টাইনও করেন নি।

চার রকম বলের আপাত-বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একই সূত্রের আওতায় আনার আকাঙ্ক্ষা তখন থেকে পদার্থবিদদের গভীরভাবে নিবিষ্ট করেছে। এই উপমহাদেশেরই একজন বিজ্ঞানী আবদুস সালাম এই একীভূতকরণের একাংশে সাফল্য অর্জনের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সার্বিক একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের কাজ এখনো চলছে নানা সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানের একেবারে কেন্দ্রীয় সমস্যা নিয়ে আপন মনে কাজ করেছেন বটে, কিন্তু কখনো তিনি শুধু নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মীদের গবেষণায় সাহায্য করতে গিয়ে তাঁর মনোযোগ নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। অনেক সময় এই মনোযোগ একেবারে খুঁটিনাটি বিষয়েও বিস্তৃত হতো। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপিকা ড. অসীমা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ১৯৩৯ সালে গবেষণার ছাত্রী হিসাবে বসুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। পরীক্ষার কাজে অধ্যাপক বসু ঢাকা থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সামান্য একটি রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছিল না বলে অসীমার কাজ এগোচ্ছিল না। এটা শুনে বসু বললেন, ঢাকায় তাঁর গবেষণাগারে থাকতে পারে, ফিরে গিয়ে দেখবেন। ফেরবার সাত দিনের মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাকে ওটা এসে হাজির হয়েছিল।

তরুণতর সহকর্মীদের সহায়তা দেবার ব্যাপারে তিনি কোনো অবস্থাতেই বিরত হতেন না। ড. অসীমা চট্টোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে একটি বড় কাজে হাত দিতে চাইছিলেন, বিভাগের কর্মকর্তারা এতে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। কেউ তাঁর কাজের জন্য একটু জায়গা ছেড়ে দিতেও নারাজ। বসু তখন বিজ্ঞানের ডিন। তিনি বললেন, 'মাঠের উপর একটি শেড তৈরি করে দেবো, অসীমা সেখানে কাজ করবেন।' বসুর দৃঢ়তা দেখে একজন অধ্যাপক এ-কাজের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন।

ইতোমধ্যে তোমরা হয়তো ভাবছ—এত বড় বিজ্ঞানী, সবসময় কঠিন সব অঙ্ক আর জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে থেকেছেন—অন্য কী রস-কষ থাকবে এমন মানুষের?

এরকম ভাবলে কিন্তু বড় ভুল করবে। সারা জীবন এই মানুষটি ছিলেন সাহিত্য ও সংগীতের একজন নিবেদিত ভক্ত। দেশি-বিদেশি সাহিত্যের বই পড়ার শখ একেবারে ছোটবেলা থেকে। সেই অভ্যাস জীবনের শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। সংগীতের প্রতি খুব টান, নিজে বাজাতেন এস্রাজ।

তাঁর ছোটবেলার এক বন্ধু লিখেছেন :

> একদিন আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে সত্যেন ও বন্ধুরা একত্রিত হলে সত্যেন প্রস্তাব করলেন, এসো, হাতে লেখা একটি মাসিক পত্র বের করা যাক। নামকরণ করলেন 'মনীষা'। সত্যেনকে আমরা সবাই সম্পাদক নিযুক্ত করলাম। মনীষা চার-পাঁচ মাস বের হয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

সারাটা জীবন সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সঙ্গ সত্যেন বসুর খুব প্রিয় ছিল। সাহিত্যিকদের মননশীল আসরে আড্ডা জমানো তরুণ বয়স থেকেই ছিল তাঁর এক শখ। শুরু করেছিলেন ছাত্রজীবনের পরপরই কলকাতায় 'সবুজপত্রে'র আসরে। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত এই পত্রিকাকে ঘিরে সেদিন নতুন ধারার তরুণ সাহিত্যিকরা একত্র হয়েছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক।

পরবর্তী সময় তিরিশের দশকে বসু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হন। এ-সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখেছেন :

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে সুধীনের 'পরিচয়' সকল দিক দিয়েই ছিল একটা বিরাট দিক পরিবর্তন। যে পাঁচ বছরকাল এই কাগজটি ত্রৈমাসিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, আমি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলাম ও সুধীনের অনুরোধে কয়েকটি রচনাও এতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিচয় প্রকাশকালে আমি ঢাকায় ছিলাম।

ঢাকায় সত্যেন বসু সাহিত্য-সংস্কৃতির নিজস্ব আসরও গড়ে তুলেছিলেন। সাহিত্যরসিক সমমনা কয়েকজন মানুষের এই নিয়মিত আড্ডাকে একটি নামও দেওয়া হয়েছিল—'বারোজনা'।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসসহ বহু বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার সম্মান সত্যেন্দ্রনাথ বসু পেয়েছেন। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী হয়ে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি পদে নির্বাচিত হবার বিরল সম্মানের অধিকারীও হয়েছিলেন তিনি। ইংরেজি, ফরাসি এবং জার্মান সাহিত্যেও সত্যেন বসুর স্বচ্ছন্দ আগ্রহ ছিল। তাঁর বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান এই ব্যাপারে তাঁর সহায়ক ছিল। জীবনের শেষ মাস কয়টিতেও তিনি বিদেশি গল্পের অনুবাদ করেছেন। হাইনরিশ বোলের জার্মান গল্পের তাঁর করা অনুবাদ এ-সময় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সত্তরতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় কলকাতায়। দেশবাসী এজন্য বড়-বড় আয়োজন করেছিল, দেওয়া হয়েছিল একটি

মর্মস্পর্শী অভিনন্দনপত্র। প্রকাশ করা হয়েছিল তিন খণ্ডের একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি কয়েকটি কথা বলেছিলেন, যা দেশের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্কটি তুলে ধরে : 'স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্প সংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যে না থাকে, সেসব যেন মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের সকলের কাছে পৌঁছে যায়।'

এর দশ বছর পর ১৯৭৪ এর ১ জানুয়ারি তাঁর আশিতম জন্মদিনের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হলো 'বসু সংখ্যায়ন'-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব। কলকাতায় ছিল এর প্রধান অনুষ্ঠান—আন্তর্জাতিক সম্মেলন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছিলেন তাতে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে ক'জন সেরা বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম বিপ্লবের ভিত রচনা করেছিলেন তাঁদের একজন পল ভিরকে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি তারবার্তা পাঠালেন—'অধ্যাপক বসুর এই আবিষ্কার আধুনিক পারমাণবিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতবর্ষ এই অসাধারণ বিজ্ঞানীর জন্য গর্বিত হতে পারে।'

এই পূর্তি উৎসবের রেশ তখনো চলছিল। দেশে-বিদেশে নানা জায়গায় বসু সংখ্যায়নের পরবর্তী প্রভাব নিয়ে চলছে জ্ঞানী-গুণীদের আলোচনাচক্র। বাংলাদেশে বসু সংখ্যায়নের সৃষ্টিভূমি ঢাকায় তাঁর উপস্থিতিতে বিজ্ঞান আসর বসবে এমন আয়োজন চলছে।

ঠিক এমনি সময়ে এলো বজ্রাঘাতের মতো খবর। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সত্যেন্দ্রনাথ বসু লোকান্তরিত হয়েছেন—কলকাতায় তাঁর ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে। সমস্ত উৎসব মুহূর্তে শোকে পরিণত হলো।

ঢাকায় তাঁর আর আসা হয়নি। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যৌবনের সৃষ্টিশীলতার পীঠভূমি ঢাকার প্রতি মমত্ব অনুভব করেছেন তিনি। ঢাকা তখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী, অনেক স্বপ্ন সেদিন এ-দেশের মানুষের মনে। এদেশকে নিয়ে ভেবেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন সত্যেন বসুও। এর কিছু পরিচয় পাই মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে লেখা একটি চিঠিতে। মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিতে গিয়ে চিঠিটি তিনি লিখেছেন এই পত্রিকার সম্পাদক বর্তমান বইয়ের লেখককে। লিখেছেন :

> ...চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ, পদ্মা-মেঘনা ঘেরা বিস্তৃত সমতল ও তার পরিশ্রমী অধিবাসীরা এসব মিলে আকর্ষণীয় করে রেখেছে চিরদিনই বাংলাদেশকে। নতুন প্রযুক্তির যুগে শিল্প কীই-বা গড়ে উঠলো, আরো দেশের প্রয়োজনীয় কত কি গড়তে বাকি রয়েছে সেসবের হিসাব আপনার সাময়িকীতে প্রকাশিত হোক।

এ চিঠিতে দেখা যায়, ঢাকার স্মৃতি তিনি একটুকুও ভোলেননি।

মনে পড়ছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন

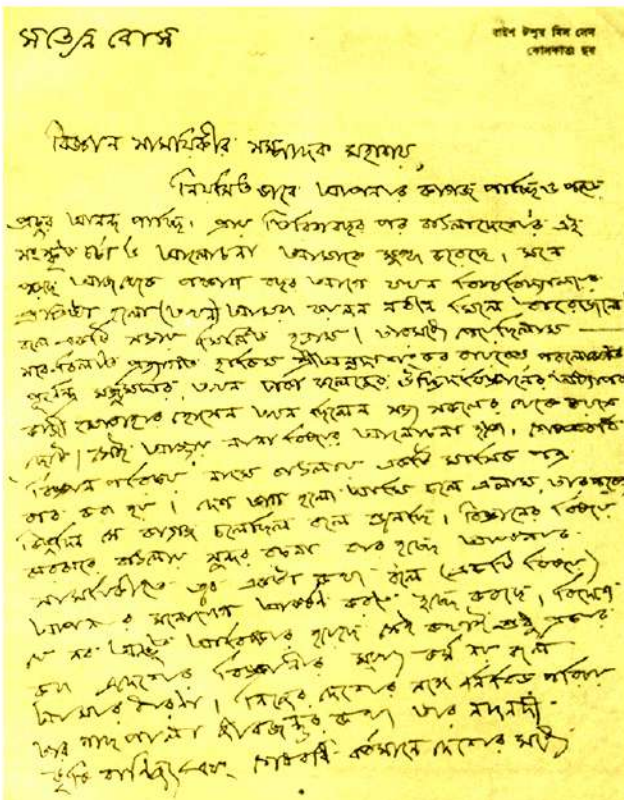

বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক মুহাম্মদ ইব্রাহীমকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিঠি (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪-এ বসুর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো, আমরা কয়জন নবীন মিলে 'বারোজনা' বলে একটি সভায় মিলিত হতাম। এর মধ্যে পেয়েছিলাম সবে বিলাত প্রত্যাগত হাকিম শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে ও পরলোকগত পূর্ণেন্দু মজুমদার তখন ঢাকা কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক। কাজী মোতাহার হোসেন তখন ছিলেন সভ্য সকলের থেকে বয়সে ছোট। সেই আড্ডায় নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। শেষ অবধি 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে বাঙলায় একটি মাসিক পত্রিকা বার করা হয়...।

আমরাও তাঁকে ভুলি নি। আমাদের বিজ্ঞানচর্চার জগতে পথিকৃৎ পুরুষ তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকখানি গৌরব তাঁকে কেন্দ্র করেই। ঢাকার কিংবদন্তির যেটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঘিরে, সেখানে তিনিই নায়ক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অগ্রসর গবেষণার জন্য স্থাপিত হয়েছে 'বসু গবেষণা কেন্দ্র', সৃষ্টি করা হয়েছে বসু অধ্যাপকের পদ। দেশে বিজ্ঞানের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তাঁর আদর্শ, তাঁর লক্ষ্য ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করছে।

প্রবীণ বয়সে সত্যেন বসু

জীবনকথা সিরিজের আরও বই

১. নন্দলাল বসু : আবুল মনসুর
২. গৌতম বুদ্ধ : আবুল মোমেন
৩. মহাত্মা গান্ধী : হিতেশরঞ্জন সান্যাল
৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য : মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর
৫. সত্যেন্দ্রনাথ বসু : মুহাম্মদ ইব্রাহীম
৬. উইলিয়াম শেকস্‌পীয়র : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
৭. বেগম রোকেয়া : মোরশেদ শফিউল হাসান

জীবনকথা ৫

মানুষের নাগালে এখন বিশ্বজগৎ।
অথচ একালে বিশ্বমানবের দেখা মেলা ভার।
মানুষের মনোজগৎ বুঝি ছোট হয়ে আসছে।
নয়তো কেন এত হানাহানি, কেনই বা হিংসা ও সন্ত্রাস,
ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুনে বিপন্ন হবে মানবতা!
এসময়ে প্রকৃত মানুষের সাথে পরিচিত হলে
পথ চলার সঠিক দিশা মিলতে পারে।
সেই ভাবনা থেকেই ছোটদের জন্য মহামানবদের
এই জীবনকথা সিরিজ।

## সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম উচ্চারিত হয় সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে। তাঁর আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পায় বোস-আইনস্টাইন থিওরি নামে। আর যে কণার কথা তিনি বলেছেন তার নাম রাখা হয় বোসন–তাঁকে সম্মান জানিয়ে। বাঙালি বিজ্ঞানীর সেই কীর্তি আজ বিশ্বসভায় আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

www.baatighar.com

ISBN 978-98-48825-34-1

9 789848 825341